এই সময়

* কথাসরিৎ *

স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ।
বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কোনও মতে চলে না,
আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।

— স্বামী বিবেকানন্দ

অগ্রাধিকার

নীতিগত অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি যে কোনও সরকারের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় সরকারের রাজনৈতিক দর্শন। অর্থনীতিতে সরকারি ভর্তুকির ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি বারংবার উঠে আসে। স্মর্তব্য, ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষি, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মতো কিছু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঋণ দিতে হয়। যেহেতু সুদের হার কম, কাজেই এই জাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে ভর্তুকির একটি অংশ আছে। অনেকেরই মতে, ভর্তুকি অপেক্ষাকৃত দরিদ্রতর শ্রেণির মানুষদের প্রাপ্য, কিন্তু চলতি প্রশাসনিক কাঠামোয় অনেক ক্ষেত্রেই সেই সুবিধা ভোগ করে অর্থনৈতিক ভাবে সম্পন্ন মানুষজন, যা এক অর্থে সরকারি অর্থের অপচয়। এই বিতর্ক আগে সাধারণত জ্বালানি বা খাদ্য ভর্তুকির প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে, সম্প্রতি পড়ুয়াদের শিক্ষাঋণও এই বিতর্কের পরিসরে চলে এল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র গভর্নর রঘুরাম রাজনের একটি মন্তব্যের দরুণ। তিনি বিদেশে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কম সুদে যে ঋণ দেয়, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, যে সব শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়তে যায় বা যেতে চায়, তারা আদৌ সমাজের অভাবী শ্রেণির মধ্যে পড়ে কিনা তা খতিয়ে দেখা উচিত, কারণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেয় ঋণ শুধুমাত্র অভাবী শ্রেণির মানুষের জন্যই বরাদ্দ। কিন্তু রঘুরাম রাজনের প্রশ্নটি যে ধারণার উপর নির্ভরশীল, সেই ধারণাটির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

প্রশ্ন ওঠার কারণ মূলত চারটি। প্রথমত, ভারতের যদি কোনও একটি ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ প্রার্থিত হয়, তবে তা শিক্ষাক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ যৎসামান্য। যা ইতিমধ্যেই অতীব অল্প, তাকে আরও কমিয়ে আনা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি অপাত্রে ভর্তুকি দান নিয়ে। বলা অসঙ্গত নয়, আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অনেক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির পড়ুয়ারাও এখন বিদেশে শিক্ষার জন্য উৎসুক। বিদেশে পঠনপাঠনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, বিশেষত আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে টাকার দরের নিরিখে, ঋণের সহায়তা ছাড়া সেই অর্থ সংগ্রহ দেশের বেশির ভাগ পরিবারের পক্ষেই কঠিন। তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষাক্ষেত্রকে দেশ ও বিদেশে বিভক্ত করা বাস্তবানুগ নয়। বিদেশের উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মেধাসম্পদের সার্বিক গুণমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অতএব, যাতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সেই সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। বিশেষত, যখন পৃথিবীর সেরা দু'শোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিও ভারতে অবস্থিত নয়। চতুর্থত, অর্থনীতির উপর উচ্চশিক্ষার একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ভারতের জনসংখ্যায় যুবাবয়স্কদের সংখ্যাধিক্যকে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হয়, তবে তাদের যত রকম ভাবে সম্ভব উচ্চশিক্ষিত সমর্থ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই কাজে যদি কোষাগারের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়, তবে সেটিই করণীয়।

(সেলফি)শ

হাওয়া দিল সরসর, বা কবি বললেন অমুক, বা নীল তিমি অবসাদে আক্রান্ত, হোক যা ইচ্ছে, তৎক্ষণাৎ ফেসবুকে তাবড় পোস্ট। সঙ্গে ছবির ছররা। ক্ষতি নেই তাতে, বিশেষ করে এই বর্তমান সময়ে ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া যে ভাবে দিন বদলানোর ক্ষমতা রাখে, তা মাথায় রাখলে। সত্যিই তো এখন কোনও ঘটনা যখন নিউজ চ্যানেল অর্থে 'ব্রেকিং নিউজ' হয়, বহু ক্ষেত্রেই তার খোঁজ মেলে এই ফেসবুক-চত্বরে। কিন্তু ঘোরতর সমস্যাও এখানে। দেখা যাচ্ছে,ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, কথা ও ছবি আকারে 'পোস্ট' করার পাশাপাশিই, ফেসবুক-এ নিজেরই তোলা নিজের ছবি, অর্থাৎ 'সেলফি' উপচে পড়ছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফেসবুক প্রোফাইলে, নিজের ছবির ভাগই বেশি। এমনিতে, এমন কাজেকর্মে কারও কিছু বলার নেই একবারেই। কারণ, নিজের প্রোফাইলে, নিজের যা ইচ্ছে, তা করতেই পারেন কেউ, যত ক্ষণ না অবশ্যই, তাতে অন্য কারও অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এক সাম্প্রতিক সমীক্ষার কথা যদি মানতেই হয়, তবে বলতেই হবে, এ হেন কাণ্ডে, বেশ অনেকেরই প্রবল অসুবিধে ও অনীহা রয়েছে। বার্মিংহ্যাম বিজনেস স্কুলের এই সমীক্ষা বলছে, যাঁরা অন্য কিছুর চেয়ে স্বগৃহীত আত্মপ্রতিকৃতি, থুড়ি, সেলফি নিয়েই অধিক বুঁদ, তাঁদের খুব একটা পছন্দ করা হয় না। আর এমন সব সেলফি'র বাড়াবাড়ি দেখে বহু মানুষজনই বেশ ভালো রকম বীতশ্রদ্ধ।

দেশজুড়েই উপনির্বাচনে পদ্ম কিছুটা ফিকে কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গে তার উল্টো ছবি কেন?

অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচনে সরকার বিরোধিতার সঙ্গে জাতপাতের সমীকরণ যেমন কাজ করেছে, তেমনই পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অঙ্ককে খেয়ালে রাখা দরকার। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক দু'মাস পর থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই উত্তরাখণ্ডে তিনটি বিধানসভা উপনির্বাচনেই কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়েছে। তার ঠিক এক মাস পরে গত ২৫ অগস্ট কর্নাটকে তিনটির মধ্যে দুটো আসনে কংগ্রেস ও একটিতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জয় লাভ করেছে। আবার একই সঙ্গে পাঞ্জাবে একটা আসনে কংগ্রেস ও আর একটা আসনে বিজেপির রাজনৈতিক মিত্র শিরোমণি অকালি দল জয় পেয়েছে। মধ্যপ্রদেশে তিনটে আসনের মধ্যে বিজেপি দুটোতে ও কংগ্রেস একটাতে জয়ী হয়েছে। ওই পর্বে বিহারে দশটা আসনের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট মাত্র চারটি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) ও কংগ্রেসের মহাজোট ছ'টা আসন পেয়েছে। বিহারে একটা আসনে বিজেপি মাত্র সাতশোর কিছু বেশি ভোটে জিতেছে। আবার গত ১৬ সেপ্টেম্বর যে কয়েকটা রাজ্যের উপনির্বাচনগুলোর ফলাফল সামনে এসেছে তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে মোদীত্বের যে জনপ্রিয়তা মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তার থেকে পদ্মের (বিজেপির নির্বাচনী চিহ্ন) রং যেন কিছুটা ফিকে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে যে ২৬টি বিধানসভা আসন বিজেপির দখলে ছিল তার মাত্র অর্ধেক আসনই বিজেপি ধরে রাখতে পেরেছে। আসামে বিজেপি আহামরি কিছু ফল করতে পারেনি আর ত্রিপুরায় বামেরা তাদের দুর্গ অক্ষত রেখেছে। গত দু'মাসের এই উপনির্বাচনগুলোর ফলাফলে যদিও এটা পরিষ্কার যে, মোদী হাওয়া বিশেষ প্রভাব আর ফেলছে না কিন্তু এটাও এই মুহূর্তে এখন বলার সময় হয়নি যে, আগামী ১৫ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা রাজ্যের যে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেখানে বিজেপি একেবারে ধরাশায়ী হবে। এই দুটো রাজ্যেই কংগ্রেস দলকে তাদের গত কয়েক বছরের সরকারকে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু বিজেপি যে বিপুল জনসমর্থন এপ্রিল-মে মাসের লোকসভা নির্বাচনেই পেয়েছিল তা কেবল দু'তিন মাসের মধ্যেই ভাটা পড়ল কেন? আসলে, বিধানসভা উপনির্বাচনগুলোতে স্থানীয় ও রাজ্যস্তরের ইস্যু, সেই রাজ্যের বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ ও রাজ্যগুলোর সর্বশেষ ও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণগুলোর ওপর নির্ভর করেছে বলেই মনে হয়। যেমন, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবের আরজেডি-র অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ যাদব গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সামাজিক ভিত্তি আছে। উল্টো দিকে, নীতিশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জেডিইউ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ কুর্মি গোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয়। তারই সঙ্গে কংগ্রেস দলের পিছনে অল্প কিছুসংখ্যক উচ্চ বর্ণের মানুষের সমর্থন আছে। বিজেপি বিরোধী এ রকম কোনও রাজনৈতিক জোট আরও শক্তিশালী হয় মুসলিম সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থনে। এমনিতেই বিহারে বিজেপির মতো মূলত একটা ব্রাহ্মণ-বানিয়া পার্টির সঙ্গে রামবিলাস পাসোয়ানের নেতৃত্বে লোকজনশক্তি পার্টির যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দলিত-জনগোষ্ঠীর সমর্থন ছিল তার বিরুদ্ধেই গত আড়াই দশকের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও মুসলিমদের একটা সামাজিক সমঝোতা গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিফলন নির্বাচনী রাজনৈতিক ময়দানে জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেস-এর মহাজোট। আমরা বাঙালিরা জাতপাতের রাজনীতির জটিল অঙ্ক খুব একটা বুঝি না। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিকে ভালো করে অনুধাবন করতে হলে জাতপাতের সামাজিক সমীকরণ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা উচিত।

উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করাটা সমাজবাদী পার্টিকে বিজেপি বিরোধী ভোটকে সংহত করতে সাহায্য করেছে। অন্য দিকে, হিন্দুত্বের জিগির তোলা বিজেপি সাংসদ স্বামী আদিত্যনাথের সংসদের ভিতরে ও উত্তরপ্রদেশের ভোটের ময়দানে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণাসর্বস্ব বক্তব্য জনসমক্ষে এসেছে তা ওই রাজ্যে ভোটাররা মোটেই মেনে নিতে পারেনি। উপরন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) কর্মীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যে তারা উত্তরপ্রদেশে মুসলিম ছেলে ও হিন্দু মেয়েদের প্রেম পরবর্তী বিবাহকে 'লাভ জিহাদ' বলে প্রচার করেছিল। এই নির্বাচনে সেই প্রচারও যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। আসলে, প্রেম ও জিহাদ (সংগ্রাম/যুদ্ধ) যে একসঙ্গে কী করে হয় সেটাই অনেকের প্রশ্ন। গুজরাট ও রাজস্থানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চাপা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়াও কিছুটা টের পাওয়া গেল এই উপনির্বাচনগুলোতে।

কিন্তু যখন বিজেপির এহেন জনসমর্থন অন্যান্য রাজ্যগুলোতে কমতে শুরু করেছে তখন, পশ্চিমবঙ্গের দুটো বিধানসভা উপনির্বাচনে (বসিরহাট দক্ষিণ ও চৌরঙ্গি) বিজেপির উত্থান তাৎপর্যপূর্ণ। বসিরহাট দক্ষিণে বিজেপি

পি টি আই

এ এফ পি

জয়পরাজয়। (উপরের সারিতে বাঁ দিক থেকে) অখিলেশ সিং যাদব, সচিন পাইলট, অমিত শাহ; (নীচের ছবিতে বাঁ দিক থেকে) লালুপ্রসাদ যাদব ও নীতীশ কুমার

> আরএসএস কর্মীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে যে তারা উত্তরপ্রদেশে মুসলিম ছেলে ও হিন্দু মেয়েদের প্রেম পরবর্তী বিবাহকে 'লাভ জিহাদ' বলে প্রচার করেছিল। এই নির্বাচনে সেই প্রচারও যে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

প্রার্থী সামান্য ব্যবধানে জয় লাভ করেছে আর চৌরঙ্গিতে বিজেপি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। অন্য দিকে, এই দুটো কেন্দ্রেই বাম প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে ও একটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, বাম নেতৃত্ব যা এখন বৃদ্ধতন্ত্রে জর্জরিত ও ২০১৩ সালের মে মাস থেকে (অর্থাৎ সারদা কেলেঙ্কারির অনতিবিলম্ব পরে থেকে) যারা রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন বিমুখ হয়েছিল তাদের মানুষ আবারও প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজ্যের প্রথম সারির বাম নেতারা অনেকেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ। সে কারণেই তাঁদের পক্ষে কোনও প্রকারের দীর্ঘমেয়াদি সরকার বিরোধী গণআন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়া মুশকিল। মনে রাখতে হবে যে, এই রাজ্যের বাম ও অ-বাম দুই ধরনের রাজনীতি থেকে আসা বিশ্বাসযোগ্য, একটা বিহিত কর। রাজনৈতিক সৌজন্য এক জিনিস আর বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে টিভির পর্দায় আহ্লাদে গদগদ অবস্থায় মাখামাখি করা আর এক জিনিস। মানুষ তো সব কিছুই দেখছেন। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে মানুষ বামেদের কেন ভোট দেবে? রাজনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে দেখতে গেলে বাম নেতৃত্ব আর নিজেদের কর্মী ও সমর্থকদের পাশে দাঁড়াতে ও তাদের রাজনৈতিক হিংসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে অপারগ। ফলত, বামেদেরই একাংশ তৃণমূল ও বিজেপির দিকে ধাবিত। স্বভাবতই এই দুটো কেন্দ্রে মানুষ তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে সমর্থন করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে চৌরঙ্গি কেন্দ্রে বিজেপি ও কংগ্রেসের হিন্দিভাষী প্রার্থীদের মধ্যে হিন্দি ভাষাভাষী ভোটাররা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে, গত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় প্রায় এগারো শতাংশ ভোট এই চৌরঙ্গি বিধানসভা উপনির্বাচনে কম পড়ার ফলে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার সংখ্যালঘু মানুষ প্রায় এককাট্টা হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে এই চৌরঙ্গি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। বসিরহাট দক্ষিণে গ্রামীণ মানুষ তৃণমূলকে অনেক বেশি সমর্থন করলেও বসিরহাট ও টাকি শহরের মানুষ বিজেপির দিকেই ঝুঁকেছে। এটা হয়তো ইতিহাসেরই পরিহাস যে তৃণমূলের সমর্থনে প্রথম বিজেপি বিধায়ক ১৯৯৯ সালের অশোকনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। আর যে তৃণমূল ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন মিলে চার-চারটে নির্বাচন এই রাজ্যে লড়েছিল, তারাই এখন ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হয়েছে। অন্য দিকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব ও কিছু বাম ইস্যুগুলোকে তৃণমূল অত্যন্ত সুচারু ভাবে গত কয়েক বছর ধারাবাহিক ভাবে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার করেছে। কিন্তু যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গর্ব বোধ করি, সেই রাজ্যেই সংঘ পরিবারের মতাদর্শে পুষ্ট বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে একটা অংশের মানুষ কেন সমর্থন করছে?

তালিবানরা আফগানিস্তানের বামিয়ানে যে ভাবে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার মতো ঘৃণ্য কাজ করেছিল ঠিক একই রকম ভাবে অন্য ধর্মস্থান ও তার নান্দনিক সৌধ ও কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে তালিবানদের বর্বরোচিত কুকর্মের কয়েক বছর আগেই সংঘ পরিবারের সক্রিয় কর্মীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল। এই সংঘ পরিবারের কর্মীরাই আরও অনেক জায়গায় মুসলিম ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদেরকে নিধন করার জন্য অভিযুক্ত। গভীর চিন্তার বিষয় যে, একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের তথ্যসমৃদ্ধ খবর অনুযায়ী গত বছরেই এই রাজ্যে ছোটোখাট সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা শতাধিক ছাড়িয়েছে। এই রকম কিছু সামাজিক সংঘর্ষকে এই রাজ্যের এক অংশের মানুষ তা হলে কি জেনেবুঝে সমর্থন করছে? আসলে কলকাতার মতো একটি তথাকথিত 'কসমোপলিটান' শহরেও মানুষের সামাজিক পরিচয় ও তার সঙ্গে জড়িত নিবাস সংক্রান্ত বিভাজন অনেকাংশে স্পষ্ট। হিন্দু বাঙালিরা মূলত শহরের কয়েকটা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করেন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোও শহরের কয়েকটা জায়গায় অবস্থিত। আবার, অবাঙালি অংশের মানুষও শহরের কিছু স্থানে সীমিত। একটু খোঁজখবর নিলে বোঝা যায়, বাড়ি ভাড়া ও বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু মানুষদের কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের শহরই যেখানে এ রকম সাম্প্রদায়িক বিভাজনের দ্বারা বিভক্ত, সেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে চাপা সমর্থন মোটেই অবাক করার মতো নয়। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল রাজনীতি যদি এই বাংলায় মাথা তুলতে না পারে, তা হলে ভবিষ্যতে এই রাজ্যের আপামর জনসাধারণের বিপদ আসন্ন। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ সেই কবে 'লোকহিত' বলতে যা বুঝিয়েছিলেন তা হল হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান। আর শিখিয়েছিলেন যে, কোনও একটি সম্প্রদায় যদি আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকে তা হলে তাদের প্রতি সংবেদনশীল ও সহমর্মী হতে। আমরা কি তার থেকে কিছুই শিখলাম না? স্বাধীনোত্তর ভারতে মুসলিম তোষণ যে হয়নি তা সাচার কমিটি ও রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন রিপোর্ট পড়লেই জানা যায়। আসলে অনেক রাজনৈতিক দল মুসলিমদের নয় বরং মুসলিম মৌলবাদীদের তোষণ করে সংবিধান ও দেশের আইনকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। সেটা যে কোনও সুস্থ ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মোটেই কাঙ্খিত নয়।

> রাজনৈতিক সৌজন্য এক জিনিস আর বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে টিভির পর্দায় আহ্লাদে গদগদ অবস্থায় মাখামাখি করা আর এক জিনিস। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে মানুষ বামেদের কেন ভোট দেবে?

আমার এক গবেষক বন্ধু সম্প্রতি এক গ্রামে গিয়ে শুনেছেন যে মানুষ বলছে, 'পুরনো বাম ছিল কাঁধে ঝোলা চলল ভোলা, পরে বাম হল কাঁধে ঝোলা পকেট ফোলা।' রাজ্য রাজনীতির পরিবর্তনের সাথে 'গেল ঝোলা তোলো তোলা'। সেই গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষ বলছেন যে, সে এমন এক রাজ্যে থাকতে চায় যেখানে 'পকেট ফোলা ঝোলা নেই, মারকুটে তোলা নেই'। আজকের এই লোককথা আমাদের রাজ্যের গত তিন দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস কেবল তিন লাইনে ব্যাখ্যা করে দেয়। তার জন্য কোনও জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনার দরকার হয় না।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক